জানালা

ভূদেব ভগত

ডোরাকাটা বিদেশী একটি খাম, একদিন দেখি পড়ে রয়েছে চিঠির বাক্সে। খুলে দেখি, চিঠিটা লিখেছে রঙ্গনা আচার্য নামে এক অপরিচিতা। নামের পাশে ব্র্যাকেটে লেখা 'রানু'। চিঠিটা এসেছে লন্ডনের ওক এভিনিউ-এর (Oak Avenue) আটশ ছিয়াশি নম্বর ব্রুম রোড থেকে। প্রথম ভাবনাতে কিছুই মনে করা সম্ভব হলো না। কিন্তু যতই চিঠির ভেতরে যেতে লাগলাম, ধীরে ধীরে খুলে যেতে লাগলো হারানো স্মৃতির পরত। মেয়েটি স্কুলের চেনা। রীতিমতো অবাক হয়ে গেলাম এরকম একটা চিঠি হাতে পেয়ে। স্কুল ছাড়ার প্রায় ছত্রিশ বছর পর চিঠিখানা লেখা। মানুষ তাহলে ভোলে না কিছুই! হয়তো ভোলার ভান করে থাকে। স্কুলের দিনগুলো বিশেষ করে, কিছুতেই মোছে না মন থেকে। ঐ সহজ সরল দিনগুলোতে মানুষ সুন্দর, মানুষের অন্তর সুন্দর, বাহির সুন্দর, ভাষা সুন্দর, ভূষা সুন্দর। তাই হয়তো ঐ দিনগুলো আঁচড় হয়ে লুকিয়ে থাকে মনের গভীরে। লন্ডনের এই চিঠিখানা ঐ আঁচড়েরই যেন সাক্ষর। বহু যুগ ধরে বন্ধ কোনো জানালা যেমন খুলে দিয়েছে, হঠাৎ পাওয়া অপ্রত্যাশিত এই চিঠিখানা।

মেয়েটির লন্ডনে বিয়ে হয়েছে। তারপর থেকে ওরা লন্ডনেরই বাসিন্দা। আগে ছিল ভট্টাচার্য। বিয়ের পর ভট্ট খসে গিয়ে আচার্য। ওর স্বামী মৈনাক আচার্য বেথেল্‌হেম রয়াল হাসপাতালের ডাক্তার। হাসপাতালটি বাড়ি থেকে বেশি দূরে নয়, একথাও লিখতে সে ভোলেনি।

লন্ডনের অ্যাকাডেমি অফ্ আর্টস, ব্যারিংটন হাউস, পিকাডিলিতে ওরা একটা প্রদর্শনী দেখতে গিয়েছিল, ছুটির দিনের বেড়াতে বেরিয়ে। এই শীতে সারা বিশ্বের চয়ন করা পুরস্কৃত ছবি সাজিয়ে সেখানে একটি আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন হয়েছে। এই প্রতিযোগিতার মূল আয়োজক ইউনেসকো (unesco) জাপান। ছবিগুলি পরে সারা বিশ্বে প্রদর্শিত হয়ে থাকে। এবার হচ্ছে লন্ডনে। লন্ডনের এই 'অ্যাকাডেমি অফ্ আর্টস্' সংস্থাটি সম্রাট তৃতীয় জর্জ ১৭৬৮ খৃষ্টিব্দে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই প্রদর্শনীতে 'ডাউন মেমোরী লেন' (Down Memory Lane) নামে আমার একটি ছবি দেখে, প্রদর্শনীর কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেখা করে, তাদের কাছ থেকে ঠিকানা সংগ্রহ করে, চিঠিখানা লেখা ঘটনার কী আশ্চর্যময়তা! চিঠি থেকে আরো জানা গেল, সে এখন এক পুত্র ও এক কন্যার জননী। দুজনেরই বিয়ে হয়ে গেছে। সবার চাইতে যা আশ্চর্য তা হলো, সে তার ব্যলাকালের স্কুলটিকে ভোলেনি। চিঠির অনেকখানি জায়গা জুড়ে রয়েছে স্কুলের স্মৃতি। স্কুলের ঠিক মাঝখানে বিশাল আমগাছ, সবই তার মনে রয়েছে। চিঠির শেষের দিকে বিশদ বর্ণনা - যদি কখনও লন্ডনে যাই, তাহলে কেমন করে পৌঁছাব ওদের বাড়ি। জানি, যাওয়া হয়তো কোনোদিনও হবে না, তবু, হঠাৎ পাওয়া এই চিঠিখানা সমস্ত শরীর মন আনন্দে, বিস্ময়ে আলোড়িত করে দিয়েছে আচমকা। "A mystery's process is the universe" ঋষি অরবিন্দের বাণী...

... শুনেছি, রবীন্দ্রনাথ তার লেখার টেবিল জানলার ধারে রাখতে চাইতেন না। আমি যেখানে এখন থাকি, সেই বাড়ি দক্ষিণের জানালা দিয়ে, বেশ খানিকটা দূরে, আমার ছোটোবেলার স্কুলবাড়িটা দেখা যায়। সম্পূর্ণ স্কুলটা নয়। লতাপাতা, বেলগাছ, আমগাছ আর অট্টালিকার আড়াল থেকে গোটা দুয়েক ক্লাশ কেবল দেখা যায়। চিঠিটা পাওয়ার পর স্কুলবাড়িটা যেন জানালার আরো কাছে চলে এসেছে। নির্জন দুপুরে কান পাতলে আজকাল শুনতে পাই স্কুলবাড়িটার দিক থেকে ভেসে আসছে মৃদু কোলাহল। গভীর চেনা ঐ কোলাহল। জানালা দিয়ে মন অনেক বছর পেছনে চলে যায়। ছোটোবেলার অনেক চেনামুখ ভেসে ভেসে চলে আসে জানালার কাছে। মনে পড়ে যায় অনেক ভুলে যাওয়া দিন। হারিয়ে যাওয়া স্মৃতি, হাসি আনন্দ দুষ্টুমির ক্ষণ...

. . . ১৯৫৪ সাল। বাবা একদিন সাইকেলে চাপিয়ে নিয়ে এসে ভর্তি করে দিয়ে গেলেন আমবাগানের ঐ স্কুলটিতে। জামশেদপুরের ঐ স্কুলটির পুরোনাম 'সাকচি উচ্চ বিদ্যালয়' (The Sakchi ঞ্জনন্ধড় ত্রন্তুড়ঙ্গঙ্গপ্ত)। প্রথম দিন আমার পরিচয় হলো রঞ্জন নামে একটি ছেলের সঙ্গে। দ্বিতীয় বেঞ্চে চুপ করে সে বসেছিল। আমি তার পাশে গিয়ে বসলাম। কথা নেই অনেকক্ষণ। তারপর আলাপ হলো ধীরে ধীরে এবং স্কুলের শেষদিন পর্যন্ত যে ক্লাশেই গেছি, দ্বিতীয় বেঞ্চে আমরা পাশাপাশি বসতাম। সেই রঞ্জন হঠাৎ মারা গেছে মাস কয়েক আগে। আমি তার শেষযাত্রায় যাইনি। যেতে চাইনি। স্কুলের প্রথম বন্ধু বেঁচে থাকুক অন্তরে...

... একটি চিঠি এবং একটি মৃত্যু ছোটোবেলাটিতে যেন বেশ খানিকটা ঝাঁকিয়ে দিয়েছে। রঞ্জন ছিল ছোট্ট চেহারার ছেলে। যদিও তখন সকলেই আমরা ছোটো, তবু রঞ্জন যেন একটু বেশিই ছোটোখাটো ছিল। অকারণে, মনে পড়ে, ওকে প্রথম দিনই শিক্ষকমহ

াশয়ের ধমক খেতে হয়েছিল। শিক্ষক মহাশয় ক্লাশে ঢুকতেই সকলে আমরা উঠে দাঁড়ালাম। রঞ্জনও উঠে দাঁড়ালো। সকলকে বসতে বলে শিক্ষক মহাশয় ধীরে ধীরে রঞ্জনের কাছে এসে ধমকের সুরে বললেন, "সবাই দাঁড়ালো, তুমি দাঁড়াওনি কেন?" "আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম স্যার" বলে বিব্রত রঞ্জন উঠে দাঁড়ালো। উঠে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষক মহাশয় তার ভুল বুঝতে পারলেন এবং পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করে দিলেন। রঞ্জন আজ নেই, কিন্তু স্কুলের প্রথম দিনের ঐ স্মৃতি আজও অম্লান হয়ে রয়েছে মনের কোনে...

...আরও কিছু দুষ্টুমিতে ভরা মুখ ভেসে ভেসে আসে গাছপাতার আড়াল থেকে। মনে পড়ে, ঢিলেঢালা ড্রইং না জানা দেবব্রতর কথা। ভারতের ম্যাপ তো দূরের কথা, একটি কলা আঁকতেই সে ঘেমে নেয়ে একাকার হয়ে যেত। আঁকা আরম্ভ করার আগেই সে বাঁ হাতের মুঠোয় রাবারখানা শক্ত করে ধরে নিত। ভুল যে হবেই। সামান্য একটু দাগ কেটেই 'এ্যাঃ' বলে বাঁ হাতের রাবার দিয়ে ঘসতে শু করত। ঘসার দাপটে মাঝে মাঝে কাগজ ছিঁড়ে যেত। মাস্টারমশাই এসে জিজ্ঞেস করতেন, "এটা কি এঁকেছো?" "কলা স্যার" দেবব্রত উত্তর দিত। "কলা স্যার তো বুঝলাম, তা নিচে লিখে দাও, লোকে বুঝবে কেমন করে," স্যার বলতেন। আমি ওকে আঁকায় সাহায্য করতাম, পরিবর্তে দেবব্রত আমায় বাদাম খাওয়াত প্রায়ই। একদিন দেখি টিফিনের সময়, বাদামওয়ালা তাড়া করে ধরে ফেলেছে দেবব্রতকে, বাদাম চুরির দায়ে। ধরা পড়ার পর উদ্‌ঘাটিত হলো তার বাদাম চুরির রহস্য। দেবব্রত বিশাল সাইজের হাফপ্যান্ট পরে স্কুলে আসত। ঐ সময় আমাদের বাবারাও বিশাল বিশাল হাফপ্যান্ট কিনে দিতেন, যাতে অন্তত তিন বছর চলে। দেবব্রততার হ্যাফপ্যান্টের বাঁদিকের পকেটটি ছিঁড়ে রাখতো এবং বাদামাওয়ালার খোন্‌চার গা ঘেঁসে দাড়াতো। বিশাল হাফপ্যান্টের ঘেরে, বেশ খানিকটা বাদাম আড়াল হয়ে যেত। ঐ সুযোগে ছেঁড়া পকেট থেকে হাত বার করে, একমুঠো বাদাম নিয়ে দেবব্রত সটকে পড়তো। ঐ ক্যাবলাচাঁদ দেবব্রতর মাথায় যে এত বুদ্ধি ছিল, কে জানতো! সেই দেবব্রতর সঙ্গে হঠাৎ একদিন দেখা। সে এখন আমেরিকায় থাকে। এসেছে কদিনের জন্য কাঁচাপাকা চুল, সোনালী চশমায় সেই দেবব্রত এখন বেশ স্মার্ট। পুরনো দিনের কথা মনে করে হেসে - গড়িয়ে নিয়ে আমার নিজেদের বয়েসটা বেশ খানিকটা কমিয়ে নিলাম। বাল্যকাল বলতেই দুষ্টুমির দিন। দায়দায়িত্বহীন জীবন। তাই বোধহয় ঐ আনন্দময় দুষ্টুমির স্মৃতিগুলোই বেশি করে ফিরে ফিরে আসে...

...ছাপান্ন -সাতান্ন সাল হবে। 'রিগ্যাল' সিনেমাতে দেব আনন্দের 'বারিশ' সিনেমাটা শু হয়েছে। সুনীল বলে এক বন্ধু আপ্রাণ চেষ্টা করে চুলটা প্রায় দেব আনন্দের মতো করে ফেলেছিল। আমি আর সুনীল, একদিন স্কুল পালিয়ে চলে গেলাম 'বারিশ' দেখতে। তখন আমাদের হাফটিকিটের বয়স। হাফ টিকিটের দাম ছিল তিন আনা। সুনীলের ভাগ্য খারাপ। ঠিক ঐ দিনই টাটা কোম্পানি বোনাস দিয়েছে এবং বোনাস পেয়ে সুনীলের বাবা মনের আনন্দে মিষ্টি কিনে নিয়ে স্কুলে এসেছিলেন, টিফিনের সময় ছেলেকে মিষ্টি খাওয়াবেন বলে। পরদিন যখন সুনীল স্কুলে এলো, তার মুখ হাঁড়ি। চোখ মুখ লাল। বোধ হয় ভালো করে ঘুমোয়নি। মুখে কথা নেই। মাথা নিচু করে গম্ভীর হয়ে কাটালো সারাটা দিন। একসময় হঠাৎ ভক্ করে হেসে উঠে বল, "জানিস্! দিদির লেডিস ছাতাটা বাবা ভেঙে ফেলেছে আমায় পেটাতে গিয়ে।"

আমি সেদিন বেঁচে গিয়েছিলাম। আমার বাবা ছিলেন খুব দাপটওয়ালা মানুষ। টাটা কোম্পানির জেনারেল ফোরম্যান বলে কথা। ধরা পড়লে যে কি হতো, কে জানে! ঐ প্রথম এবং শেষ। আর কখনও স্কুল পালিয়ে সিনেমা দেখতে যাইনি। সেই সুনীলেরএখন মাথা জোড়া সুবিশাল টাক।

মনে পড়ে, বাবা একদিন 'বাইসাইকেল থিবস্' সিনেমাটা দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল, সাইকেলে চাপিয়ে। বিখ্যাত সিনেমা নাকি! কিছুই বুঝিনি ঐ বয়সে। শুধু মনে আছে, বাবা আমাকে বেশ কয়েবার বাইরে পাঠালেন দেখে আসতে, আমাদের সাইকেলটা চুরি যায়নি তো!

সিনেমা অনেকক্ষণ চলতে চলতে হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল। ছোটো বিরতি। ফিল্ম ছিঁড়ে গেছে। বাবা ডালমুট আর পাপড় কিনে দিলেন, সাইকেলটাও দেখে এলেন। মিনিট কুড়ি লাগলো ফিল্ম জোড়া লাগিয়ে সিনেমা শু হতে। সিনেমা শু হলো, কিন্তু পর্দায় কেবল 'দি এন্ড' লেখাটাই এলো। সবাই হাসতে হাসতে বেরিয়ে এলাম হল থেকে। আমরা বাড়ি ফিরে এলাম সাইকেলে চেপে...

... মাঝে মাঝেই ঐ সময় দেখতাম, সিনেমা চলতে চলতে হঠাৎ বন্ধ হয়ে যেত। পর্দায় দেখা যেত, কী সব গলে গলে ঝরেপড়ছে। আশে পাশের লোকেরা বলতো, ফিলিম্‌মে আগ লাগ গিয়া। পরে বড় হয়ে জানলাম যে, পুরনো দিনের ফিল্মগুলো তেমন অগ্নিরোধক বা উত্তাপরোধক ছিল না। প্রজেক্টার ল্যাম্পের অত্যধিক উত্তাপে মাঝেমাঝেই ফিল্ম গলে যেত। প্রায় তিন চার ফুট ফিল্ম কেটে ফেলে দিয়ে পুনরায় জোড়া লাগিয়ে, আবার সিনেমা চালু করা হতো। হ্যালোজেন ল্যাম্প আবিষ্কার হওয়ার পর ঐ ঘটনা এখন আর দেখা যায় না। তাছাড়া এখনকার ফিল্ম অনেক বেশি উত্তাপ সহ্য করতে পারে। ঐ টুকরো টুকরো ফিল্মগুলো বাজারে ফুটপাতে কিনতেও পাওয়া যেত। আমরা কিনে নিয়ে আতসকাচ লাগানো একটি যন্ত্রের সাহায্যে ঐ সব ফেলে দেওয়া ছবিগুলো দেখতাম এবং রূপালী জগতের মানব মানবীদের দেখে শিহরিত হতাম। টাটা কোম্পানি ১৯২৯ সাল থেকে শহরের নানা জায়গায় বিনে পয়সায় সিনেমা দেখানোর ব্যবস্থা করেছিল, দর দূরান্তের শ্রমিক পরিবারের মনোরঞ্জনের জন্য ইটের দেয়ালে সাদা রং লাগিয়ে কিছু স্থায়ী পর্দা করা হয়েছিল। মাঝে মাঝে কাপড়ের পর্দা টাঙিয়ে বাইস্কোপ দেখানো হতো। লোকে বলতো 'ফকোটিয়া সিনেমা'। পর্দার দুপাশেই ম

ানুষজন ভিড় করে বসে দেখতো। কারণ কাপড়ের পর্দার দুপাশ থেকেই দেখা যেত। তবে উল্টোদিকে সবই উল্টো দেখাতো, বাঁহাতে খাচ্ছে, বাঁহাতে লিখছে, বাঁহাত দিয়ে তরোয়াল লড়াই করছে। তবু কী আনন্দ! ঐ সব রোমাঞ্চকর দিনগুলো আর আসবে না...

... একগাদা মার্বেল থাকতো প্রণবের পকেটে। প্রচন্ড তার ক্রিকেট আর গুলি খেলার নেশা। ঐ সময় খুব প্রচলন হয়েছিল মার্বেলগুলি খেলার। গুলি দিয়েই কত রকমের যে খেলা ছিল তার ইয়ত্বা নেই। গুলির ধাক্কায় ধাক্কায় রাস্তার ধারে বসার রোয়াকগুলো খয়ে খয়ে, সব উধাও হয়ে গিয়েছিল। যা আজ অব্দি আর তৈরি হয়নি। প্রণব থাকতো স্কুলের সব চেয়ে কাছে। আসতো সবার শেষে। ঘন্ট া পড়ে গিয়েছে, রোল কল প্রায় শু হতে চলেছে, ঐ সময় ঝড়ের বেগে প্রণব ক্লাশে ঢুকতো, তেল চিটচিটে চুলগুলো ডান হাতের অ াঙুল দিয়ে আঁচড়াতে আঁচড়াতে। বাঁ হাতে বইয়ের ব্যাগ। মাথা আঁচড়ানোরও তার সময় নেই। আরও কতরকম যে খেলার আবিষ্ক ার হয়েছিল ঐ সময়, সব গুনে শেষ করা যাবে না। আশর্চ্য মজার মজার সব নাম। কালের হাওয়ায় সব আজ উধাও। বেশ কিছু ন াম আজও স্মৃতির খাতায় লেখা হয়ে রয়েছে যা ভুলে যাওয়া সম্ভব নয় - সাতগুটি, ছু-কিৎ, গুলিডান্ডা, গোল্লাছুট, ঝাড়বাঁদর, ম ালচোর, এক্কাদোক্কা, গোবরডাঙা, আত্তিপাত্তি, শিকগাড়োয়াল, কড়ি, তাড়ি, নওগোটিয়া, বাদ্দিবল, বাঘবকরী, আণডাভুল, দাড়িব াধাঁ, দেওয়ালচোট, গুলিচোট, গুলিজিৎ, ঠিপ্পিজিৎ, চোর চোর, লেংড়ি গোড় ইত্যাদি। এ সবের সঙ্গে ঘুড়ি লাটাই, লাট্টু লেত্তি, ম াঞ্জা, সুরী এসব তো ছিলই। সমস্ত খেলাই আজ ফেরার। তেসরা মার্চ, জামশেদজী টাটার জন্মদিন উপলক্ষ্যে স্কুল থেকে প্রভাতফেরী করে আমরা যেতাম তাঁর মূর্তির পাদদেশে, তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে। সেটাও আর হয় না কোম্পানি থেকে মিষ্টি বিতরণ হতো ঐ দিনে। সন্ধেবেলায় হতো আতসবাজীর মহোৎসব, বাঘাকুদার লেকের ধারে। জুবিলী পার্ক তখনও তৈরি হয়নি। ১৯৫৭ সালে এলো নতুন পয়সা। পুরনো পয়সা ভুলে গিয়ে, নতুন পয়সা হজম করতে, মনে আছে, আমাদের বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। তখন একটি রসগো ল্লার দাম ছিল এক আনা। ঐ এক আনা ব্যাপারটা মাথায় এমন ভাবে বসে গিয়েছিল যে, নতুন পয়সাতে সেটা কত হবে, কিছুতেই ম াথায় ঢুকতো না প্রথম প্রথম। যাইহোক পরে সব সড়গড় হয়ে গেল। ১৯৮৫ সালের ৩রা মার্চ পন্ডিত জওহরলাল নেহ উদ্বোধন করলেন বৃন্দাবন গার্ডেনের আদলে তৈরি জুবিলী পার্কের...

... 'বারে বারে কে যেন ডাকে আমারে' - মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের এই গানটি বাবলু প্রায় সবসময় গাইতো। ওর খুব প্রিয়ছিল। ব াবলু অর্থাৎ সন্তোষ চক্রবর্তী, আমার আর এক সহপাঠি। একই ক্লাশে সেও ভর্তি হয়েছিল। বাবলু থাকতো, শহরের মাঝে একটা বিরাট পুকুর ছিল, তার পাশে। বাবলু বেশ ভালোই গাইতো। আমি ওর সাইকেলের সামনের রডে বসে, সাইকেলের লাইটট াকেতবলা করে নিয়ে, বেধড়ক তাল দিতাম ওর গানের সাথে। বাজানোর দাপটে একদিন কাচটাই ভেঙে গেল। ঐ সমস্ত গান যেমন নেই, তেমনি সেই বিরাট পুকুরটিও আজ নেই। আর বাবলু এখন বিশাল চুল দাড়িতে প্রায় রবিঠাকুর। আমায় দেখলে এখনও তার ঐ গানের দিনগুলোর কথা মনে পড়ে এবং চুল দাড়ি চশমার আড়ালে চোখ ছল ছল করে ওঠে। দক্ষিণের এই জানালা দিয়ে দূরের ঐ স্কুল বাড়িটার দিক থেকে, পুরনো দিনের আরও কত গানের সুর ভেসে ভেসে আসে - সাত ভাই চম্পা, মধুর আমার মায়ের হা সি, বাঁশি কেন গায়, দুটি পাখি দুটি তীরে, যে আঁখিতে এসো হাসি লুকোনো, চাঁদের এতো আলো, তীর ভাঙা ঢেউ, জোছনা বিছ ানো আঙিনায়, সাত নলী হার দেবো, বাঁশ বাগানের মাথার ওপর, পাল্কি চলে, কোনো এক গাঁয়ের বধূ, তীর ছেড়ে এসে মাঝে দরিয়ায় পিছনের পানে চাই, এতো সুর আর এতো গান, -আরও কত গান আর সুর ...

... এমন গান, এমন সুর আর হবে না। কেন হবে না, কেউ জানে না। মনে হয় প্রচন্ড সততাই এই সব সৃষ্টির মূলমন্ত্র ছিল। বছরে ঐ সময় দুটি মাত্র গান বার হতো দুর্গাপুজোর ঠিক আগে। অধীর আগ্রহে সকলে অপেক্ষা করে থাকতাম ঐ গানের জন্য। শহরে "কম্প্যানিয়ন" নামে একটি রেকর্ডের দোকান ছিল। দোকানটিও আজ নেই। কিন্তু তার মালিক মিঃ ম্যাকওয়ানা সাহেব আজওঅ াছেন, নববই -এর কোঠায় বয়স। ঐ সময় দম দেওয়া চোঙ্গাওয়ালা একটি গ্রামাফোন। হিজ মাষ্টার ভয়েসের তৈরি একটি রেকর্ডের দাম ছিল দু টাকা বারো আনা। দুটি গান থাকতো দু পিঠে। টুইন কোম্পানির রেকর্ডও পাওয়া যেত দু'টাকা চার আনা দিয়ে। ঐ সময়কার বিখ্যাত গান 'একবার বিদায় দে মা এক্সটেন্ডেড প্লে রেকর্ডে চারটে গান। থাকতো। লং প্লে ছিল দু'রকমের। একটি দশইঞ্চি আর একটি বারো ইঞ্চি। দশ ইঞ্চিতে দশটি গান এবং বারো ইঞ্চিতে বারোটা গান থাকতো। কালচক্র পৃথিবীকে আজ কোথায় নিয়ে এসেছে, আরও কোথায় নিয়ে যাবে কে জানে! এখন সাড়ে চার ইঞ্চির একটি ডিস্কে প্রায় দেড়শো গান থাকে...

..."আমার সঙ্গে ম্যানেজারের মুখ চেনা আছে" শ্রীমান পতিত, এই বাংলা বাক্যটির ইংরেজী করেছিল "আই হ্যাভ এ কোলাবরেছন ইউথ মাই ফেস টু ম্যানেজার ফেস্"। পতিতের পুরো নাম ছিল পতিতপাবন পাতর। কেমন করে যেন সে বুঝে ফেলেছিল, ইংরেজী বলতে না পারলে জীবনে উন্নতি নেই। তাই মাঝে মাঝেই পতিতের মুখ থেকে এরকম ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর ইংরেজী আমাদের শুনতে হতো। পতিতের বাঁদিকের কাঁধটি ইংরেজী বলার সময় তিড়িং তিড়িং করে লাফাতো। সেই পতিতপাবন একবার এক ক্লাশ থেকে আর এক ক্লাশে ওঠার সময় মাত্র এক নম্বরের জন্য ফেল করে গিয়েছিল। বাড়িতে বকুনি এবং কানমলা যা জোটবার তা তো জটলই। পতিতের মনে খুব দুঃখ। দুঃখের কারণ, ওকে পড়ে থাকতে হবে পুরনো ক্লাশে, আমরা এগিয়ে চলে যাবো। সজল বলে পতিতের এক প্রিয়বন্ধু ছিল। পতিত ওকে বলল, "ভাই ছজল, আমাকে মনে রাখিস।" পতিত 'স' কে 'ছ' বলতো। ঐ সময় একটা নিয়ম প্রচলিত

করেছিলেন আমাদের প্রধান শিক্ষক মহাশয়। পরীক্ষা হয়ে গেলে ছাত্র ছাত্রীদের খাতা দেওয়া হতো, নিজেদের ভুলগুলোস্বচক্ষে দেখে নেওয়ার জন্য। এমন হয়তো ঐ ব্যবস্থা নেই। বাংলার শিক্ষক সেন মাষ্টারমশাই ছিলেন ক্লাশে। পতিত ছুটে তাঁর টেবিলের স ামনে গিয়ে, প্রচন্ড উত্তেজিত হয়ে উর্দ্ধাসে বলতে লাগলো, ''ছার, আমি ছার পাস। এই দেখুন ছার, আমার উপাধি ছার পাতর, প াত্র নয়, আপনি ছার পাতর কেটে দিয়ে পাত্র করে দিয়েছেন, আর ছার এক নম্বর কেটেও নিয়েছেন।'' সেন মাষ্টারমশাই চশমার ফঁ াক দিয়ে একবার খাতা, একবার পতিতের দিকে বার দুয়েক তাকালেন। যাইহোক, শেষমেষ পতিতকে পাশ ঘোষণা করা হলো। পতিতকে আমি বললাম তোমার ভাই ভাগ্য খুবই ভালো। পতিত বললো, ''আমি কে 'হু আর ইউ'? ঐ আপস্টেয়ারে যে ভদ্রলে াকটিবসে আছেন তিনি সব'', বলে দুহাত জড়ো করে ওপরের দিকে একবার তাকাল। স্কুলের শেষ দিন পর্যন্ত সে আমাদের সঙ্গে ছিল। কিন্তু শেষ দিনটি পতিত বোধহয় জীবনে কোনোদিনও ভুলতে পারবে না। স্কুল ছাড়ার দিন আমরা সকলে গিয়েছিলাম প্রধ ানশিক্ষক মহাশয় কে প্রণাম জানাতে। পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে গিয়ে ইংলিশ ম্যানটির বুক পকেট থেকে, প্রধানশিক্ষক মহাশয়ের ঠিক প ায়ের কাছে, টুপ করে খসে পড়ল একখানি সিগারেট...

... যত কুঁড়ি ফোটে, সব কুঁড়ি ফুল হয় না। যত ফুল ফোটে, অকালে ঝরে যায় অনেক ফুল। যারা থাকে, তারা সবাই নৈবেদ্য হতে প ারে না। কোনো কোনো মানুষ ফুলেরই মতোন তার চারপাশে অদৃশ্য সুরভি নিয়ে আসেন। এমনিই সুরভির আভা ছড়িয়ে আমাদের স্কুলে যোগ দিলেন চিত্ত মাষ্টারমশাই এবং কিছুদিনের মধ্যেই সমস্ত স্কুলটিকে মন্ত্রমুগ্ধের মতোন আপন করে নিলেন। খেলাধুলো, অ াবৃত্তি, নাচগান, থিয়েটার, ছবি আঁকা সব কিছু যেন হৈ হৈ করে বেড়ে গেল। চিত্ত মাষ্টারমশাই হয়ে গেলেন সকলের চিত্তদা। কার ভেতরে কী প্রতিভা আছে, তিনি যেন বুঝে ফেলতে পারতেন এক লহমায়। আরও একজন প্রিয় মাষ্টারমশাই ছিলেন, বারীন স্যার। সরস্বতী পুজোর আগে একবার উনি ঠিক করলেন, স্কুলের বড় হলঘরটিতে দেওয়াল জুড়ে ছবি আঁকা হবে। আঁকা হবে বুদ্ধদেবের জীবনী। তাঁর জন্ম থেকে নির্বাণ পর্যন্ত। সবার শেষে থাকবে বুদ্ধদেবের ধ্যানগম্ভীর একটি মুখ। ছবি আঁকার সমস্ত দায়িত্ব এসে পড়ল আমার ওপর। ছবি আঁকা আরম্ভ হলো এবং একদিন শেষও হলো। আজও জানি না কেমন করে ঐ বিশাল কর্মকান্ড সম্ভব হয়েছিল। নানা রঙের চক্, খড়িমাটি, গেয়ামাটি দিয়ে আঁকা হয়েছিল দেওয়াল জোড়া ঐ ছবিগুলো। সঠিক গুর সঠিক প্রেরণা এবং উৎসাহে বোধহয় অনেক অসম্ভব কাজও সম্ভব হয়ে যায়। ছবি আঁকার সময়, বেণী দোলানো ছোট্ট একটি মেয়ে, সমানে আমায় সাহায্য করত। রঙ তুলি খড়িমাটি যখন যা প্রয়োজন হতো, সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে দিত। হাতে গেয়ামাটি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো ঘন্টার পর ঘন্ট া। অবাক চোখে দেখতো আমার ছবি আঁকা। আমি তার হাত থেকে গেয়া মাটি নিয়ে ছবি এঁকে যেতাম আপন খেয়ালে। স্কুলের দেয় ালে ঐ ছবিগুলো হয়তো এখন নেই। সময় মুছে দিয়ে চলে গেছে। কিন্তু সহজ সরল ঐ ছবি আঁকার দিনগুলো আজও মোছেনি মন থেকে।

চিত্তদাও যেমন হঠাৎ একদিন এসেছিলেন, হঠাৎই চলে গেলেন। শুনলাম উচচ শিক্ষার্থে তিনি বিদেশে চলে গেছেন। আর ফিরে অসেননি। আসবেন না, কোনোদিনও। একদিন খবর এলো, তিনি আর নেই আর সেই ছোট্ট মেয়েটি, যে করতলে গেয়ামাটিনিয়ে দঁ াড়িয়ে থাকতো ঘন্টার পর ঘন্টা, তারই নাম 'রানু'।